## আত্মার স্বরূপ (Nature of the Soul):

রাধাকৃষ্ণণ এর দর্শনে বর্ণিত আত্মার স্বরূপকে বুঝতে হলে শুরুতেই দুটি বিষয়কে জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ রাধাকৃষ্ণণ এখানেও ভারতীয় পরম্পরার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছেন এবং এজন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের চরম আধ্যাত্মিক চরিত্রের ওপর। দ্বিতীয়তঃ তিনি মানুষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ও বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, মানুষকে যেমন জগতে দেখছি, তাহল দৈহিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক একক ব্যক্তিত্ব, যার সত্তা নির্ধারিত হয় সহজাত প্রবৃত্তি (instinct), উদ্যম (drives) এবং উদ্দেশ্য (motives) দ্বারা। সুতরাং তিনি সচেতন ছিলেন যে মানুষ হল আত্মসর্বস্ব এবং আত্ম-অতিক্রমকারী, স্বার্থপরতা এবং বিশ্বজনীন ভালবাসার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই দৃষ্টকোণ থেকেই তিনি আত্মার স্বরূপ'কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে তার পক্ষে সহজ হতো মানুষের স্বাভাবিক ও দৈহিক সত্যতাকে অস্বীকার করা, যেমন করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকরা। কিন্তু একজন আধুনিক চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি কখনই বাস্তবতা বর্জিত মানুষ হতে পারেন না। তাই তিনি নতুন পথ খুঁজে নিয়েছেন। তিনি একদিকে স্বীকার করলেন আত্মার চরম আধ্যাত্মিকতাকে, আবার অন্যদিকে মূল্য দিলেন দৈহিক জীবনের সত্যতাকেও। তিনি সব সময় একথাই বলতে চেয়েছেন দৈহিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন কখনই বেমানান নয় - একে অপরের পরিপূরক। মানব জীবনের দৈহিক দিকের সত্যতার সঙ্গে আত্মার চরম আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কোন বিরুদ্ধতা নেই। এটাই রাধাকৃষ্ণণ এর আত্মা সম্পর্কিত দর্শনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। এই আলোকেই তিনি আত্মার স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণাকে বিকশিত করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি এভাবে চিন্তা করার কারণ, মানুষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর গভীর বোধ ছিল। এ কথা সত্য যে মানুষ আজ বিজ্ঞানের দয়ায় তার পূর্বপুরুষদের থেকে অনেক বেশি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ লাভ করেছে - অন্ততঃ বাহ্যিকভাবে। মানুষের হাতে আজ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সকল উপকরণই মজুত। বিজ্ঞান মানুষের হাতে শুধু স্বাচ্ছন্দই তুলে দেয়নি তাকে বিলাসীও করে তুলেছে। কিন্তু একটু গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আজ মানুষের জীবনের এতো সুখের মধ্যেও মূলে অস্থির - এমনকি অসুখী একটা ভাব থেকেই গিয়েছে, মানুষ তার জীবনের স্বাদ হারিয়েছে। ক্রমাগত 'একঘেঁয়েমি জনিত বিরক্তি' তাকে গ্রাস করছে। খুব তাড়াতাড়ি সে তার ভালবাসার বিষয়বস্তুর থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, জীবনের আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখার কোন পন্থা-প্রকরণই আর থাকছে না। আমাদের একক এবং সামাজিক জীবন, এতো বেশি যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে যে আমরা সকলেই কম-বেশি এক একটা 'যন্ত্র' হয়ে উঠেছি। এই সচেতনতাই তাঁকে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখায়। তাঁকে ভাবায় - কেন মানুষ ভুলে গিয়েছে নিজের 'মানবত্ব'কে?

তিনি অনুভব করেছিলেন এর মূল কারণ মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ

## আত্মার স্বরূপ (Nature of the Soul):

রাধাকৃষ্ণণ এর দর্শনে বর্ণিত আত্মার স্বরূপকে বুঝতে হলে শুরুতেই দুটি বিষয়কে জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ রাধাকৃষ্ণণ এখানেও ভারতীয় পরম্পরার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছেন এবং এজন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের চরম আধ্যাত্মিক চরিত্রের ওপর। দ্বিতীয়তঃ তিনি মানুষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ও বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, মানুষকে যেমন জগতে দেখছি, তাহল দৈহিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক একক ব্যক্তিত্ব, যার সত্তা নির্ধারিত হয় সহজাত প্রবৃত্তি (instinct), উদ্যম (drives) এবং উদ্দেশ্য (motives) দ্বারা। সুতরাং তিনি সচেতন ছিলেন যে মানুষ হল আত্মসর্বস্ব এবং আত্ম-অতিক্রমকারী, স্বার্থপরতা এবং বিশ্বজনীন ভালবাসার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি 'আত্মার স্বরূপ'কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে তার পক্ষে সহজ হতো মানুষের স্বাভাবিক ও দৈহিক সত্যতাকে অস্বীকার করা, যেমন করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকরা। কিন্তু একজন আধুনিক চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি কখনই বাস্তবতা বর্জিত মানুষ হতে পারেন না। তাই তিনি নতুন পথ খুঁজে নিয়েছেন। তিনি একদিকে স্বীকার করলেন আত্মার চরম আধ্যাত্মিকতাকে, আবার অন্যদিকে মূল্য দিলেন দৈহিক জীবনের সত্যতাকেও। তিনি সব সময় একথাই বলতে চেয়েছেন দৈহিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন কখনই বেমানান নয় - একে অপরের পরিপূরক। মানব জীবনের দৈহিক দিকের সত্যতার সঙ্গে আত্মার চরম আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কোন বিরুদ্ধতা নেই। এটাই রাধাকৃষ্ণণ এর আত্মা সম্পর্কিত দর্শনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। এই আলোকেই তিনি আত্মার স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণাকে বিকশিত করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি এভাবে চিন্তা করার কারণ, মানুষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর গভীর বোধ ছিল। এ কথা সত্য যে মানুষ আজ বিজ্ঞানের দয়ায় তার পূর্বপুরুষদের থেকে অনেক বেশি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ লাভ করেছে - অন্ততঃ বাহ্যিকভাবে। মানুষের হাতে আজ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সকল উপকরণই মজুত। বিজ্ঞান মানুষের হাতে শুধু স্বাচ্ছন্দই তুলে দেয়নি তাকে বিলাসীও করে তুলেছে। কিন্তু একটু গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আজ মানুষের জীবনের এতো সুখের মধ্যেও মূলে অস্থির - এমনকি অসুখী একটা ভাব থেকেই গিয়েছে, মানুষ তার জীবনের স্বাদ হারিয়েছে। ক্রমাগত 'একঘেঁয়েমি জনিত বিরক্তি' তাকে গ্রাস করছে। খুব তাড়াতাড়ি সে তার ভালবাসার বিষয়বস্তুর থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, জীবনের আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখার কোন পন্থা-প্রকরণই আর থাকছে না। আমাদের একক এবং সামাজিক জীবন, এতো বেশি যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে যে আমরা সকলেই কম-বেশি এক একটা 'যন্ত্র' হয়ে উঠেছি। এই সচেতনতাই তাঁকে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখায়। তাঁকে ভাবায় - কেন মানুষ ভুলে গিয়েছে নিজের 'মানবত্ব'কে?

তিনি অনুভব করেছিলেন এর মূল কারণ মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ

করেছে আপন জীবনের বৈজ্ঞানিক পন্থা-প্রকরণের উপর। বিজ্ঞান যেন মানুষের সব কিছু নির্ধারণ করে দিতে পারে - এমনই দাবি তার। কিন্তু আধুনিক মানুষ ভুলে গিয়েছে শুধু মানুষের দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতিকে জানলেই প্রকৃত মানুষের স্বরূপ জানা হয় না। প্রকৃত মানুষকে কেবলমাত্র স্নায়বিক অথবা মস্তিষ্ক সর্বস্ব অথবা দৈহিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত করা যায় না।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন তিনি একথাও বলতে চাননি যে মানুষের বিজ্ঞানসম্মত রূপটি মিথ্যা। তিনি শুধু একথাই বলছেন যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ মানুষের কেবল একপেশে দৈহিক স্বরূপ প্রকাশ করে, মানুষের সমগ্র দিকগুলি শুধু বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা প্রকাশিত হয় না।

রাধাকৃষ্ণণের মতে, মানুষের দুটি দিক - একটি দিক, উৎসাহিত করে বৈজ্ঞানিককে তাঁর নিজের পথে মানুষের ব্যাখ্যা দিতে। অপর দিকটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়। তবে প্রথাসিদ্ধভাবে যেমন 'দেহ' এবং 'আত্মা' বলা হয়, সেরকমভাবে তিনি মানুষের এই দুটি দিকের চরিত্রচিত্রণকে যথাযথ মনে করেননি। কারণ তাতে মনে হবে আত্মা প্রতিনিধিত্ব করে কেবলমাত্র সেইসব চরিত্রগুলির, যেগুলি স্পষ্টভাবে দেহে অনুপস্থিত। তাঁর মতে, বরং এই দুটি দিককে 'সান্ত' (finite) এবং 'অনন্ত' (infinite) বলাই অপেক্ষাকৃতভাবে ভাল। 'সান্ত' দিকটি মোটামুটিভাবে দেহেরই দিক, তবে মানুষের দৈহিক দিকের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি আছে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিনি 'আত্মা' শব্দটি খুব বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করেছেন। এমনকি দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন প্রকণতা আছে যা নিজেকে অতিক্রম করে যায় হামেশাই - যাকে তিনি 'আত্মার ক্রিয়া' বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মানবাত্মার দুই ধরণের ক্রিয়ার কথা বলেছেন, আত্মা কেবল 'অভিনব' মানুষের ক্ষেত্রেই। আর এর দ্বারাই প্রকৃতির অন্যান্য দিক থেকে আত্মাকে বিভাজন করা যায়।

একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা মানবিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষ সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষকে কখনই সম্পূর্ণ 'নির্ধারণ' করা যায় না তার শ্রেণী-চরিত্র দ্বারা। প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্ট জীব, জড় বা উদ্ভিদের শ্রেণী-চরিত্র দেখে আমরা তার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি যদি কেউ কোন স্ফটিক (Crystal) অথবা কোন উদ্ভিদ, এমনকি কোন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরও শ্রেণী-চরিত্র ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে, তবে সে দাবি করতেপারে যে, সে প্রকৃতির সেই সৃষ্ট বিষয়টিকে যথাযথভাবে জানে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এমন দাবি কখনই করা যায় না। কারণ মানুষের ক্ষেত্রে শ্রেণী-চরিত্রের নিজস্ব কিছু গুরুত্ব থাকলেও একক চরিত্রই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সাধারণ চরিত্র জানলেই মানুষকে প্রকৃত জানা যায় না। বস্তুতঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে 'অভিনবত্ব' (Unique) এবং সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ এর মানব প্রকৃতির আলোচনায় যথেষ্ট মিল রয়েছে।

আর একটি দিক থেকেও মানবাত্মার ক্রিয়া অভিনব। মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্ট বিষয় থেকে আলাদা এই জন্য যে সে নিজের ইচ্ছা পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে পারে। সে অন্ধভাবে কাজ করে না। সে যদি ইচ্ছা করে তবে পূর্বেই নিজের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট হতে পারে। দার্শনিকভাবে বলা যায়, মানুষেরই কেবল ক্ষমতা আছে ভবিষ্যৎকে পূর্বেই স্থির করার। একেই রাধাকৃষ্ণণ 'আত্ম-অতিক্রমণ' (self-Transcendence) বলেছেন, মানুষই কেবল নিজের সাধারণ ক্ষমতার পশ্চাতেও যেতে পারে। এটাই মানবাত্মার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া।

ক) মানুষের সান্ত দিক (The finite aspect of man):

রাধাকৃষ্ণণ এর মতে মানুষের সান্ত দিক হল সেগুলি - যেগুলি নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতাগত অথবা পরিবেশগত শর্ত দ্বারা। সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষের দৈহিক দিকটিই সান্ত অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। একে 'সান্ত' বলা হয়, কারণ এর নির্ধারণ করার উপাদানগুলিও নির্ধারিত হয় জানা শর্তগুলি দ্বারা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষের সান্ত দিকগুলি নির্ধারিত হয় জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা অথবা শরীরবিদ্যা দ্বারা। এই দিকগুলির প্রকৃতিগত ব্যাখ্যা ঐ সব বিজ্ঞানের দ্বারা পাওয়া সম্ভব।

মানুষের এই সান্ত দিকটির 'অভিনবত্ব' হল সব সময় এক্ষেত্রে মানুষের দৈহিক সত্তাকে একটি পরিবেশের মধ্যে অবস্থানকারী (subject) হিসাবে চিন্তা করা হয়। প্রতিনিয়ত চারপাশের পরিবেশ থেকে 'উদ্দীপনা' (stimuli) এসে তাকে উদ্দীপিত করছে, এবং ব্যক্তি এককভাবে তার 'প্রতিক্রিয়া' (response) করছে। এই প্রতিক্রিয়ার ধরণ থেকেই ব্যক্তির আচরণ এবং চারত্র নির্ধারিত হচ্ছে। সুতরাং মানুষের দৈহিক প্রাতাক্রয়া নির্ধারিত হয় উদ্দীপনা দ্বারা। রাধাকৃষ্ণণ মানুষের এই দিকটিকে নানা নামে চিহ্নিত করেছেন - অভিজ্ঞতাগত মানুষ (empirical man), দৈহিক মানুষ (physical man), প্রকৃতিগত মানুষ (natural man), দৈহিক ব্যক্তি (bodily individual) প্রভৃতি।

এই দিকটিকে বিশ্লেষণ করলে একটি ভীষণ কৌতূহলদ্দীপক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা সম্ভব। প্রথমতঃ যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ধর্ম-দার্শনিক এই দিকটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে গুরুত্ব দিয়েছেন আত্মার প্রকৃত স্বরূপের দিকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন বহু গ্রন্থে দৈহিক দিককে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক দিক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, রাধাকৃষ্ণণ কিন্তু তাদের সঙ্গে একমত হননি। তিনি মানুষের দৈহিক সংগঠনটিকে আত্মার একটি দিক বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, 'The realm of spirit is not cut off from the realm of life. To divide man into outer desire and inner quality is to violate the integrity of human life ... the two orders of reality - the Transcendent and the empirical are closely related.' (The Bhagvad Gita p-13).

রাধাকৃষ্ণণ এর এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে কম-বেশি পরিপূর্ণতাবাদীর (Perfectionist) অনুরূপ মতবাদ বলা যায়। তিনি মনে করতেন মানুষের দৈহিক প্রকৃতিকে কখনই দমন বা বাতিল না করে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। কেননা দৈহিক দিক যদিও সত্য, কিন্তু কেবল একটি 'পর্যায়' মাত্র। একে অতিক্রম করে যেতে হবে। এই পর্যায়ের সত্যতা ততক্ষণই, যতক্ষণ মানুষ এই পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এটাই মানুষের সর্বশেষ স্বরূপ নয়। এই সান্ত দিককে অতিক্রম করেই মানুষকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হবে।

খ) মানব প্রকৃতির অনন্ত দিক (The infi··te aspect of Man's Nature):

এই দিকটিকে মানবাত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশের দিক বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে মানুষের এই দিকটিতে ঘটে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ। 'আধ্যাত্মিকতা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্দিষ্ট

করা খুবই কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে 'আধ্যাত্মিকতা' হল অভিজ্ঞতালব্ধ কোন কিছুর থেকে উচ্চতর কিছু। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পদ্ধতিতে 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয় বিষয়ের' মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পদ্ধতি এই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের পার্থক্যকে অতিক্রম করে যায়। যেমন 'আত্ম চেতনা'র ক্ষেত্রে ঘটে। এক্ষেত্রে 'জ্ঞাতা' নিজের সম্পর্কেই সচেতন হয়। অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়ও সে নিজে। ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের প্রভেদ অবলুপ্ত হয়। আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষণ হল আত্ম-সচেতনতা। এই আত্ম-সচেতনতার সূত্রই তাকে বেঁধে রাখে নানা অসঙ্গতির মধ্যেও। এই আত্ম-সচেতনতাই তাকে দেয় একক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা। সুতরাং এটাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

রাধাকৃষ্ণণ বলেন, প্রতিনিয়ত আমরা নিজেদের মধ্যে 'এক ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ'কে বহন করি। এই স্ফুলিঙ্গই আমাদের নানারকম মহান কাজ করতে উদ্দীপিত করে। আমরা অসহায় মানুষের দিকে সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিই। আমরা কঠোরভাবে নৈতিকতাকে অভ্যাস করি। অপরকে সাহায্য করার জন্য নিজেরা কষ্ট স্বীকার করি। এগুলো কেন করি? জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। এই আত্ম-ত্যাগমূলক ক্রিয়াকলাপ তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ কোনভাবে নিজের মধ্যে এক 'বিশ্বমানব'কে অনুভব করে।

আবার, কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করব নান্দনিক আনন্দের অভিজ্ঞতাকে, বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করাকে, ধর্মীয় সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করাকে? এ সবই হল মানুষের আধ্যাত্মিক আচরণ। আবার কোন এক অসাধারণ মুহূর্তে আমাদের জীবনে ঐশ্বরিক উপলব্ধি ঘটে যায়। নানাদেশে বহু মহান ধর্মগুরুর, স্বজাজাত অভিজ্ঞতার কথা রাধাকৃষ্ণণ উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধ, যীশু, যরথুষ্ট, মহম্মদ এঁরা পরিষ্কারভাবে আমাদের দেখিয়েছেন ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতালাভের অধিকারী আমরা হতে পারি।

মানুষের মধ্যে যদি শুধু সীমাবদ্ধতাই থাকতো, তবে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য মোক্ষলাভের জন্য কেন এতো আকুল হয়? যার সম্পর্কে কোন ধারণা নাই সে বিষয় সম্পর্কে কখনই কোন মানুষ আকাঙ্খা করে না। মোক্ষলাভের আকাঙ্খা হল মানুষের সেই অনন্ত আধ্যাত্মিকতার দিক, ঐশ্বরিক দিক।

মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রকৃতির উপস্থিতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিক হল, সবচেয়ে অনৈতিক, বদমাইস লোককেও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। তার অনেক উদাহরণ ইতিহাসে দেখা গিয়েছে। রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন, বিবর্তনের ইতিহাস হল মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তার ক্রমশ বিকশিত হওয়ার ইতিহাস। এই কারণেই বিবর্তন যত এগিয়েছে তত জীবনের ভঙ্গি এবং মানুষের আচরণ পাল্টিয়েছে। আদিম মানুষের থেকে সভ্য মানুষের আচরণ বদলিয়েছে। এছাড়াও মানুষের আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা স্পষ্ট এবং আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে বিবর্তনের গতি ছিল কম-বেশি যান্ত্রিক। কিন্তু যখন মানুষ এলো তার কার্যকলাপ এবং আচরণও বিবর্তন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সক্রিয় অংশগ্রহণ করল সে বিবর্তন পদ্ধতির সঙ্গে। মানুষের মধ্যে যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে - তার বড় প্রমাণ এটাও।

এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণণ উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হল তার আধ্যাত্মিকতা। যাকে এক অর্থে ঐশ্বরিক প্রকৃতিও বলা যায়।